সে

অনিতা অগ্নিহোত্রী

সারা সকাল জঙ্গলে ঘুরে বিরক্ত হয়ে ফিরে এসেছে সবুজ জিপসি। তার কোমর পর্যন্ত লালচে ধুলো। নেমে পড়েছে জহ্নু, তার কলিগের স্ত্রী রুহি, রুহির বর উদয়। অমলা শাড়ি পরেই বেরিয়েছিল। জিপসিতে ওঠার জন্য ছোট যে মই এঁর মতন খাড়া সিঁড়ি আছে সকালে সেটা বেয়ে উঠতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। তবে নীচে নামা, এক পা এক পা করে, অতটা সোজা নয়। জহ্নু তার একটা হাত ধরবে, অমলা ভেবেছিল। কিন্তু তার দিকে না তাকিয়েই জহ্নু গটগট করে নেমে বনবাংলোর বাইরে রাখা চেয়ারগুলির একটাতে এলিয়ে বসে পড়েছে। ধপ্‌ধপে সাদা কভার পরানো রঙীন বেতের সোফা, চেয়ার। রুহি আর উদয় গিয়ে ঢুকেছে তাদের নিজেদের ঘরে। জহ্নুর চা চাই। বেলা সাড়ে এগারোটা। এই সময় বাড়ীতে বা অফিসে সে মিড্ মর্নিং টী পায়। তার ঘড়ি নিঝুম অরণ্যেও একইভাবে চলছে। চলবে।

কুর্তা লেগিংস, সালোয়ার কামিজ- সব গুছিয়ে নিয়ে এসেছে অমলা। জহ্নুর 'ট্রাভেল লাইট'এর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও। তবুও আজ সকালে বিপুল শীত ও কুয়াশার মধ্যে বেরিয়ে পড়ার আগে ধূসর ছাই সূতির চান্দেরীটাই বার করল। এই অরণ্যের কাছে যেতে গেলে যেন অন্য কিছু মানায় না। রঙীন জামাকাপড় নয়, সুগন্ধি নয় — অরণ্যে যেতে হবে যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক হয়ে — অবনীশ বলেছিল কাল রাতেই। অবনীশ সামনের সীটে বসেছিল জিপ্‌সি তে। ড্রাইভারের পাশে। ভোরে ঠাণ্ডা ছিল বলে যে খাকীর টুপি মাথায় চড়িয়েছিল, এখন খুলে নিয়েছে। অবনীশ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অমলাকে। বলছে আসুন। একটা করে পা সোজা নীচে ...

এই মডেলের গাড়ি এখন আর শহরে চলে না। অমলা বলল। নিন্দের মত শোনাল কি? কারণ অবনীশ বলল, আমাদের মত জংগুলে মানুষদের চলে যায়। দাঁড়ান। চা বলি।

জহ্নু বলে উঠল, ধ্যাস! চার ঘন্টা নষ্ট।

অমলা মনে মনে ভাবে, এই মানুষটাকে সত্যিই চেনে কি সে? অবনীশের মুখে হাসি, যদি সেই হাসির উপর দিয়ে কোনও মেঘচ্ছায়া এক পলকের জন্য বয়ে গিয়ে থাকে, অমলা বুঝতে পারবে না। জহ্নু পরোয়া করবে না। যে টাকা দিয়ে অরণ্যের সময় কিনেছে, সে সব সম্পদের উপর দাবি রাখে। ফাইনান্সের মানুষ নাকি এই রকমই হয়। তাদের সব ইনভেস্ট্‌মেন্ট এর ফাইলান্সিয়াল টার্গেট থাকে, সে টার্গেট ফস্‌কানোর সূত্রপাতেই তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবেই।

অবনীশ অমলাকে ব্রেকফাস্টের পর নীচু গলায় বলেছিল, আসলে আমাদের উপরও একটা চাপ কাজ করে, জানেন তো। জঙ্গলে এসে ট্যুরিস্ট একটাই জিনিস চায়। বাঘের সাইটিং। আমরাও খুব চেষ্টা করি। হয়ে গেলে তো আমারও স্যাটিসফ্যাকশন— কিন্তু পুরো ব্যাপারটা তো আমারও হাতের বাইরে।

ঘন্টাদুয়েক অরণ্যপথ দিয়ে ঘোরার পর একটা খোলামেলা জায়গায় ওরা বসে ব্রেকফাস্ট সারছিল। বনের মধ্যে খাবার খাওয়া, খাবার ছড়ানো ছেটানো বারণ। সব ট্যুরিস্টদের জন্য একটা ফাঁকা জায়গা রাখা আছে। তার এককোণে জঙ্গল বিভাগের বীট ঘর। টেবিল থেকে তার উপর ফরেস্ট গার্ড সাজাচ্ছিল স্যান্ডুইচ্ কলা ডিমসেদ্ধ ফ্লাস্কে চা। এ সবই ট্যুরিস্ট বাংলোর কিচেন থেকে বাসে করে তুলে আনা। ব্রেকফাস্ট খেয়ে জহ্নু, রুহি আর উদয় যখন হেঁটে দেখতে গেল খোলা এই ছাউনির প্রান্তসীমায় আর কি আছে, নতুন কোনও গাছ, বন ফেলে মানুষের কাছে এগিয়ে আসা কোনও প্রাণী, তখনই অবনীশ যেন স্বীকারোক্তির মত দ্রুত কথাগুলি বলে ফেলে অমলাকে। অমলা কিছু জানতে চায়নি। অবনীশ হয়তো ভেবেছিল, ঠিকই ভেবেছিল, যে অমলা বুঝতে পারবে। এবং কোনও অবসরে কথাটা জানিয়ে দেবে জহ্নু আর উদয়কে। মন্ত্রী এমপি এম এল এ রা তুমুল কাণ্ড করেন। চব্বিশ ঘন্টার জন্য সকলে এসে বলে, বাঘ দেখাও, যে করেই হোক। তখন ওপর থেকে আমার বসেদের ফোন আসতে থাকে। অবনীশ, ডু সামথিং ... কিন্তু কি করব বলুন। আমাকে জবাবদিহি করতে হয়, আমি কত বার সাইটিং করেছি গত পাঁচবছরে — আমি কেন ওদের দেখাতে পারছি না—

বাঘেদের মনে মনে কতবার বলেছি, তোমরা দয়া করো, আমার পড়া মন্ত্র শোনো, আর বন ফুঁড়ে হাজির হও, তারাও তো কথা শোনে না—

খিল খিল করে হেসে ওঠে অমলা! ইস! সত্যি— আপনার মন্ত্রে কোন কাজ হয় বলে তো মনে হয় না। কাজ হ'লে তো বেঁচেই যেতাম, অবনীশ বলে। এই ঘোর জঙ্গলের মধ্যে বাসা ক'রে পড়ে আছি, স্টাফ রান্না করে দিচ্ছে, কখনো নিজেই রাঁধি। বর্ষা নেই শীত নেই, সূর্য ওঠার আগে জঙ্গলে বেরোনো — আর আমার বাঘিনীও তো অসন্তুষ্ট। শহরে আলাদা বাসা ক'রে আছে, ছেলেটার স্কুল। আমি ছুটি পাই না, ছেলেটা কতদিন বাবাকে দেখে না — এ সবই তো বড় বড় লোকেদের সাইটিং না করাতে পারার পাপে—

তবে কি ভয় হয় জানেন তো — নেশা হয়ে যাচ্ছে আমার! বনটা পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে আমায় যত দিন যাচ্ছে। শহরের বাড়িতেও রাত ফুরোবার আগে ঘুম ভেঙে যায় — মনে হয় পাখিরা ডেকে উঠেছে, পাতা উড়ে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে ... নেশা যদি গাঢ় হয়ে যায় — হয় তো আমি আর বেরোতেই পারবো না এখান থেকে।

চা এসে গেছে বারান্দায়। তবু অমলা ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন করে অকারণে। তার চুলে গেঁথে আছে অরণ্যের নিশ্বাসে বয়ে আসা ঘাস, কুটো ছোট পাতা, ফড়িঙের ডানার টুকরো। সারা শরীরে একটা অদ্ভুত বনজ গন্ধ জাড়িয়ে আছে। দ্রুত হাতে শাড়ি থেকে সালোয়ার কামিজে নিজেকে বদলে পার্থিব হয়ে উঠতে চেষ্টা করে অমলা।

তখনও তার চরাচর জুড়ে বিচিত্র প্রজাপতিদের ওড়াওড়ি, অচেনা প্রাণীদের পায়ের শব্দ, গাছেদের বদলাতে থাকা রং। অমলার ভালো লেগেছে এই বন — জহ্নু যাই বলুক।

কলকাতা ছাড়ার আগে যে সব আত্মীয় বন্ধুরা তাদের শুভযাত্রা বলেছে, সকলেই কামনা করেছে তারা চকিতে হলেও দেখা পাক অরণ্যের রাজার। এই আগ্রহ নিয়ে দলে দলে মানুষ আসে অরণ্যের ভিতর, আর তাদের অনেকেই ফিরে যায় ব্যর্থতার স্মৃতি নিয়ে — অথচ যেখানে এসেছে তার শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ কিছুই নিয়ে যায় না সঙ্গে।

এই তো তাদের ফেরার পথেই বুড়ো গাছের কোটরে জড়াজড়ি করে বসেছিল গাছেরই বাকলের রঙ্ পেঁচার তিন গম্ভীর ছানা, চিত্রল হরিণের দল আশঙ্কায় ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল, একটা মারমুখো পুরুষ গাউর, হাঁটু অবদি ধব্ধবে সাদা লোম তেড়ে গেল অন্য একটাকে — তার ফিছল গায়ে রোদ ঠিকরোচ্ছে, লালমুখো বাঁদররা পলকে চলে যাচ্ছে এ ডাল থেকে ও ডালে। যুবক বারাসিংগা সুঁড়ি পথ পার হয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ডাগর চোখে তাদের দেখছে। ছোট নালার খরস্রোতে ভাঙাচোরা ছায়া ফেলে চুপ করে বসেছিল তুঁতে নীল মাছরাঙা। শেয়ালেরা দল পাকিয়ে ধুলো উড়িয়ে ছুটে যাচ্ছিল ঘাসের মাঠে। শঙ্কিত সম্বর হরিণ তৃণভূমি পার হ'তে হ'তে বনের করিডরে ঢুকে তাদের দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল। এ সব কিছু না?

হাত মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে পোশাক পাল্টেছে অমলা। বারান্দায় তখনও জহ্নু ঘ্যান ঘ্যান করে বলে যাচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি অনেক কিছু, এতে পয়সা উসুল হয় না। ছোট খাট পাতি জীবজন্তু সব ...

ঠিক আছে কাল তো আবার যাবো আমরা। এখন চলুন, আপনাদের ট্যুরিজম এর হোটেলে ছেড়ে আমি বাসায় যাই ...

না, না, অবনীশ, আপনিও আসুন আমাদের সঙ্গে। রুহি আহ্লাদী গলায় বলে। আপনি এত কিছু জানেন ...

যেন জানাটা লাঞ্চের নেমন্তন্নের পূর্বশর্ত। দুপুরে খেতে যাওয়ার আগে সবাই যখন পায়ে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে, বনবাংলোর মোরাম বিছানো আঙনটা থেকে চারদিক একবার দেখে নিল অমলা। অদ্ভুত জায়গাটা। দেড়শো বছরের পুরোনো খড়ের ছাউনি দেওয়া একটা কুঠীকে রং চং করে, টালির ছাদ বসিয়ে সাজানো গোছানো হয়েছে। ঐ টুকু ঘাসজমি যেন কোনও মতে পরিষ্কার করে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে অরণ্যকে। জঙ্গলটা গোল হয়ে ঘিরে আছে বনবাংলোকে। দিনের বেলাতেও দেখলে গা ছম্ছম্ করে, বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ঘন সেগুন জঙ্গল, তার সঙ্গে অর্জুন, আসন হরিতকী বহেড়া মহুয়া যেমন মধ্যভারতের বনে হয়। চিরহরিৎ বন। বড় বড় সেগুন পাতা খসার শব্দ হচ্ছে ঘাসের উপর। টি টি করে টিট্টিভ ডাকছে, ঘু ঘু, বনটিয়া, শালিখ, চড়াই। মাঝে মাঝে সর সর করে কিছু চলার শব্দ যেন স্তব্ধতা ছাপিয়ে উঠছে। দুর আকাশে শঙ্খচিলের কান্না। বনটা যেন কেবল গাছের সমাহার নয়, তার চেয়ে একটু বেশি কিছু, অমলা ভাবছিল। এর ভিতরে কোথাও যেন একটা প্রাণ জেগে আছে, রক্তমাংস গরম নিঃশ্বাস লালা আর

তৃষ্ণাজাগা প্রাণ। যেন দমবন্ধ করে চুপ করে লুকিয়ে আছে, অমলা একটু অন্যমনস্ক হলেই লাফিয়ে পড়বে।

গতকাল রাতে তারা এসেছে। নাগপুর থেকে সিওনীর রাস্তা ধরে। থেমে থেমে আসছিল, এত দেরী হবে বুঝতে পারেনি। যখন এসে পৌঁছোল, তখন দশটা বেজে গেছে, অথচ মনে হচ্ছে যেন গভীর নিশুতি রাত। নিকষ কালো আকাশের সব ক'টি তারামণ্ডল ঝুঁকে পড়ে ওদের দেখছে। প্রবল শীত। অরণ্য যে কাছেই আছে তা বোঝা যায়, যদিও অল্প আলো জ্বলা বনবাংলোর রাত বারান্দা দেখে তখন ওরা বুঝতেই পারেনি বন এত কাছে। বুঝতে পারল সকালের আলো ফোটার পর। ঝলমলে সবুজ হলুদের একটা বিশাল ঘেরাটোপ যেন আলোয় ধুইয়ে দিচ্ছে চারধার।

ট্যুরিজ্‌ম্‌ এর হোটেলটা হাঁটা পথ। বনের ভিতর দিয়েই। দুপুরের রোদে অল্প তাপ জেগেছে। দিনের বেলা এখান দিয়ে হেঁটে যাওয়া যায়। রাতে হয়তো কেউ হাঁটতে সাহস করবে না। সাজানো গোছানো ছড়ানো হোটেলটা। সামনের দিকে ডাইনিং হল। মাঝে জাপানী বাগান, তার পর সারি সারি দোতলা কাটেজ। বড্ড বেশি সাজানো যেন। বনের পাশে এমন মানায় না। খাবারগুলোও পাঞ্জাবী রেসিপি, এখানে বসে খেতে অদ্ভুত লাগে। তেল তেল, ঝাল, ট্যুরিস্টরা রিলাক্স করতে আসে বলে ওদের নাকি এমনই ভালো লাগে।

ম্যানেজারই এগিয়ে এসে জানালেন, এর পাশ দিয়ে একটা ওয়াকিং ট্রেইল গেছে, মানে পায়ে চলা পথ। পথটা গেছে একটা নদীর স্রোত ধরে ধরে। নদীটার নাম বন্‌জরি। বন্‌জরি মানে বঞ্জরভূমির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে কি? বান্‌জারা কথাটাও চেনা। যাযাবর শ্রেণীর লোকজন। ওয়াকিং ট্রেল ধরে খানিকটা পথ যেতে যেতে জহ্নু অমলার কোমর জড়িয়ে ধরে বলে — বনজরি — আমার বউটা একটা বন্‌ — জরি —

অবনীশ যেন একটু অস্বস্তিতে আছে। মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে বলে, আসলে বন্‌-জরি কথাটার কোনও মানে হয় না এখানে। কথাটা হ'ল বন্‌-ঝরি বা বনের ঝরণা। লোকের মুখে মুখে 'জ' হয়ে গেছে 'ঝ' টা!

রুহি আর উদয় পাশাপাশি হাঁটছে। চুপচাপ। ওদের মধ্যে উত্তাপ নিভে গেছে যেন। লিগ্যাল সেপারেশন এর কথাবার্তা চলছে, পাঁচ বছরের ছেলেটার কি হবে তাই নিয়ে দুজনেই একটু চিন্তিত। ছেলেকে রুহি মায়ের কাছে রেখে এসেছে। অরণ্যের কাছে এসে দুজনে হয়তো আবার নিজের মধ্যকার হারানো উষ্ণতা খুঁজে বার করতে চাইছে। যখন সবার মধ্যে থাকে, দুজনেই যেন একটু বেশি জোরে হাসে, অকারণে হাত ধরে, অথচ রুহির চোখের নীচে কালি, উদয়ের খড়ি ওঠা ঠোঁট দেখলে মনে হয় ওদের বাইরেটা আর ভিতরটা এক নয়। রাতে খুবই উৎপাত করছিল জহ্নু। নানা ভাবে ঠেলাঠেলি দিয়ে ঘুম ভাঙাচ্ছিল অমলার। শীত বেশ ঘন এ দেশে। গত রাতের মত খাওয়া দাওয়ার পর আর বাইরে বসেনি ওরা। তাড়াতাড়ি চলে এসে কম্বলের তলায় ঢুকেছে। বাইরের জঙ্গল থেকে নানা রকম ডাক ভেসে আসছে। যদিও অবনীশ দিনের বেলা বুঝিয়েছিল, ওর কোন্‌টা হল বনকুকুরের ডাক, কোন্‌টা হায়না, কোন্‌টা বার্কিং ডিয়ার ভালো করে বোঝা যায় না।

পাখিরা ঘুমোতে গেছে। কম্বলের নীচে জহ্নুর শীতল আঙুলগুলি অমলার শরীরের স্পর্শে উষ্ণ হয়ে উঠেছে। সকালে বাঘ না দেখতে পেয়ে যে রাগ জহ্নুর উপর ভর করেছিল, এখন তা সোহাগ হয়ে অমলার শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। অবনীশ আসবে ভোরে, খুব ভোরে ওদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে কথা দিয়েছে।

বনবাংলোর হাতার ভিতরেও বাঘ দেখেছে অবনীশ, জানো? হ্যাঁঃ বাড়িয়ে কথা বলা ওর স্বভাব ...

অ্যাই, আমি কিন্তু না ঘুমোতে পারলে সকালে উঠে যেতে পারবো না — একদম জ্বালাবে না—

জহ্নু ঘুমিয়ে পড়লে অমলা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ।

দশ বছর বিয়ে হয়েছে। তাদের সন্তান নেই। তবু কোনদিন তাদের জোড় আলাদা হয়ে যাবে ভাবলে অমলার বুকের ভেতর কেঁপে ওঠে। মাঝে মাঝে জহ্নুকে অসহ্য লাগে অমলার, তবুও। তাদের দাম্পত্যে কোনো ফাঁক নেই। জহ্নু যেন একটা বুড়োটে অর্জুন গাছ, আর অমলা ওর উচু ডাল থেকে ঝাঁপিয়ে জড়িয়ে নামা রাঙা মাহুলের লতা। মাঝে মাঝে লতার কি মনে হয় না এই গাছটাকে ছেড়ে অন্য কোথাও নিজে একটা গাছ হয়ে দাঁড়াই? কে জানে! জল খেতে উঠে জানলার কাঁচ একটু ফাঁক করে বাইরের থমথমে বারান্দার আলো অন্ধকার দেখল অমলা। যদি সে সত্যিই উঠে এসে থাকে বারান্দায়, দরজায় ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে থাকে। ফিরে এসে জহ্নুকে জড়িয়ে ধরে কম্বলটা কান পর্যন্ত টেনে নিল অমলা।

শীত, খুব শীত। জিপসির পেছনের খোলা সীটগুলিতে আরও ঠাণ্ডা। তাই আজ অবনীশ পেছনে বসেছে। অমলা সামনে ড্রাইভারের পাশে। ড্রাইভার স্থানীয় গোণ্ড ছেলে, মুখে কুলুপ এঁটে গাড়ি চালাচ্ছে যন্ত্রের মত। সামনে হয়তো মাথা আর কান কন্‌কন্ করছে না কালকের মত। কিন্তু দুই পা জড়িয়ে শীত ওঠে, চোখে জল এসে যায়। হাত কাঁপে। আঙুলে আঙুল ঘষেও নীলাভ শৈত্য যায় না। পিছনে রুহির কাঁধ জড়িয়ে বসেছে উদয়। জহ্নুর হাত নিসপিস করে উষ্ণ কিছু জড়ানোর জন্য। বাংলায় বলে, আরো সামনে বসো মরো শীতে কেঁপে—

অবনীশ জহ্নুর কথা বুঝতে পারে কিনা জানা যায় না। ও বলে, এখানে কিন্তু ঠাণ্ডা খুব পড়ে। ক্রীসমাসের দিন সকালে তাপমান শূন্য হয়ে গিয়েছিল। পাখিদের কষ্ট হয় ঠাণ্ডায়। ঐ দেখুন মাহুলের পাতাও কালচে রঙ ধরেছে।

বনটা আসলে সমতল নয়। অরণ্য ছড়িয়ে আছে পাহাড়ের উচ্চাবচ তলে। তাই মনে হয় পথ যেন কোথাও উঠছে, আবার নামছে। কিন্তু বনের মধ্যে যে তৃণভূমিগুলি আছে, সেগুলি সমতল। ওইগুলি এক সময় ছিল গ্রাম, মানুষের বসত। তখন দুর্দম শালজঙ্গলে তৃণভোজীরা যথেষ্ট ঘাস পেত না। ফলে লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছিল বারাসিংগা। ওদের জন্য লাগে উন্মুক্ত, আর্দ্র ভূমি।

এখন গ্রামগুলিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বনের বাইরে। ফলে অবাধ তৃণভূমি পেয়ে

বারাসিংগার দল সংখ্যায় বেড়েছে — ওরা জলজ দাম আর গুল্ম খায়। জলে নাক ডুবিয়ে খাবার খোঁজে। ঐ যে দেখুন, ভেজা শরীর, ভিজে শিং নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জলের কাছেই।

দলটা ওদের বনপথ থেকে দূর — তবু দেখা যায় — অমলা তৃষ্ণার্তের মত দলটাকে দেখছিল। ওর কাছে এই শীতল মৃদু রোদমাখা সবুজ পিঙ্গল বনভূমি, পশু পাখি সবই যেন মায়া জলে স্নান করে উঠেছে।

নীচে দেখুন, পিছন থেকে অবনীশ বলে দিচ্ছে।

— ওটা কি বলুন তো?

— বাঘের পায়ের দাগ? পাগমার্ক?

জহ্নু যেন লাফিয়ে পড়বে।

না। ও চিত্রল হরিণের শিং পড়ে আছে।

পথের ধারে, ঘাসের মধ্যে, কেউ তুলে নিয়ে যায় না এখানে। ঐ পড়ে থাকা শিং আবার একটু চিবিয়েও যায় অন্য হরিণ। বারাসিংগাদেরও শিং ভারি সুন্দর, আঁকাবাঁকা।

জানেন তো, ঘন বরষায় বারাসিংগাদের রং বদলে হয়ে যায় যেন সোনালী। বনের মানুষ জন বলে, এরাই হ'ল সেই সোনার হরিণ বা মায়ামৃগ — সীতা যাকে চেয়েছিলেন। রামায়ণের ওই ঘটনাও তো ঘটেছিল বরষায়।

যাঃ, আপনি বড্ড বানান তো! আপনি কি আদ্যোপান্ত রামায়ণ পড়েছেন নাকি?

না, না সত্যি, না-পড়লেও, ভেবে নিতে দোষ আছে? এখানে বর্ষা খুব ঘন হয়। তুমুল বৃষ্টি। নিঃশব্দে ভেজে বাইসন, বারাসিংগা, গাউর, পাখির দল!

— আর সে?

জহ্নুর প্রশ্নে হেসে অবনীশ বলে, হ্যাঁ সেও ভেজে।

জহ্নু মন থেকে সরাতে পারছে না হলুদ কালো ডোরার সেই বিদ্যুৎকে, যে ওদের ধরা দিচ্ছে না কিছুতেই।

তখন অবশ্য বাইরের লোকদের আসা বারণ, পথ ভেঙে যায়। কাদায় পিছল হয়ে ওঠে। এই রকম জীপের সাফারি বন্ধ হয়ে যায়। কেবল হাতির পিঠে চড়ে আমরা যাই দেখতে সব ঠিকঠাক আছে কিনা।

আমি কিন্তু একবার বর্ষায় আসবো — অমলা বলে।

অবনীশ নীচু গলায় বলে, আপনার জন্য কোনও ঋতুতেই নিষেধ নেই।

জহ্নু শুনতে পায়। কিন্তু হয়তো আকাশ থেকে নেমে আসা ঠাণ্ডার দাপট তার ঠোঁট বন্ধ করে রাখে। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না তার, শুনতেও নয়। এতবড় একটা বনে 'সে' কোথাও নেই।

কিসলির দিকে চলেছে ওরা, বনের অন্যপ্রান্তে। পথে অরুয়ার তৃণভূমিতে কুয়াশার চাদর শান্তভাবে পড়ে আছে — মাঠ সাদা। পাখিরা ডাকে।

ধুনুরীর তার যন্ত্রের মত মধ্যে মধ্যে বিরতি দেওয়া আবার টি টি করে আকাশ জোড়া ডাক।

কিস্‌লি যাবার পথে পড়ে ঘন অরণ্য — কিসলির কিছু আগে বাঁশের বনও দীর্ঘ। ফাঁপা বাঁশগাছে ভরা। পথের দুধারেই দীর্ঘ ও খর্ব দুই জাতের বাঁশ। শাল যেহেতু চিরহরিৎ তারা রৌদ্রের তৃষ্ণায় উল্লম্ব হয়ে যেতে থাকে আকাশের দিকে। বাকি গাছেরা যারা দীর্ঘ নয়, তারাও এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতায় দীর্ঘ হয়ে বেড়ে চলতে থাকে। উঁচু নীচু পথ। মাঝে মাঝে কাঠ ও মাটি লেপে বানানো নীচ সাঁকো।

পথের ধারেই এক জায়গায় বড় জামগাছ একটা।

দেখেছেন? রোমান্টিক গলায় বলে অবনীশ, ড্রাইভারকে গাড়ী স্লো করতে বলে।

কী? কী? কী?

উদ্‌গ্রীব জহ্নু, তার পিছনে উদয় এবং কিছুটা কৌতুহলী রুহিও প্রায় উপছে পড়ছে খোলা জীপ থেকে।

অর্জুন গাছের বাকলে, বেশ কিছুটা উঁচুতে বাঘের আঁচড়ের দাগ। তাজা।

নীচে দেখুন, দেখুন — গাছের বাকলটা খাবলে তোলা — ওটা খেয়ে গেছে সজারু। সজারু অর্জুনের, জামের বাকল খায়। ক্যালসিয়ামের লোভে হরিণের ফেলে দেওয়া শিংও কামড়ায়। আর বাঘ খেতে ভালোবাসে সজারু। সুস্বাদু নরম তুলতুলে মাংস।

কে জানে সজারুর জন্যই বাঘ গাছের ওপর ঝাঁপিয়ে ছিল কিনা?

ইস্‌স্‌ — হয়তো ওদের আসার কয়েক মিনিট আগেই এখানে ছিল বাঘটা!

অতটা তাজা নয় অবশ্য, গত কাল বা পরশুর আঁচড়ও হতে পারে। সজারু খেতে যাওয়া বাঘের পক্ষেও য়থেষ্ট বিপজ্জনক। অন্ত্রে কাঁটা ফুটে মারা গেছে এমন বাঘের মৃতদেহও পাওয়া গেছে।

বনের ওপ্রান্তে কিস্‌লি। এ প্রান্তে মুক্‌কি। মুক্‌কি থেকেই বেরিয়েছে ওরা ভোরে। কিস্‌লি পৌঁছবার কুড়ি কিলোমিটার আগে থেকেই দুপাশে বাঘের পায়ের দাগ। আবার গাড়ী থামানো। ঝুঁকে পড়ে, নেমে পড়ে খুঁটিয়ে দেখা। বাঘ, বাঘিনী, দুই ছানা। মনে হচ্ছে একেবারে ফ্রেশ। অবনীশ বলে। সবাই সতর্ক হয়ে যাচ্ছে মুহূর্তে, গম্ভীরও। জহ্নু বলে, চলো চলো উঠে পড় সবাই গাড়িতে ওঠো।

আশেপাশে সকালের রোদে ময়ূর ঘুরছে। ছুটে পালাচ্ছে জংলী বরাহ। বাঘ এত কাছে, তবুও? অবনীশ বলে, বাঘ যদি ক্ষুধার্ত না হয়, তার কাছে, আশোপাশে থাকতে অন্য প্রাণীরা ভয় পায় না। কিন্তু বাঘের যখন খিদে পায়, তখন তার পাকস্থলী থেকে নির্গত হয় গ্যাস্ট্রিক জুস এর ঘন গন্ধ — সেই গন্ধ পেলে আতঙ্কের ডাক দেয় বন্য প্রাণীরা, পাখিরাও — সম্বর হরিণ, চিত্রল হরিণ ডাকে— অনেক তীব্র স্বরে কুক্‌ কুক্‌ ডাক। বার্কিং ডিয়ারের ডাক কুকুরের ডাকের মতন। পাখিরাও ডাকে, লঙ্গুরও— সবাই সবাইকে সতর্ক করে দেয়।

বাঘ তবে ক্ষুধার্ত ছিল না। এখনও নয় হয় তো। তাই আর যাতায়াতের কোনও খবর দিচ্ছে না শান্ত শীতল বন। সবাই নিশ্চুপ। ক্ষুণ্ণ মনে গাড়ীতে বসে ওরা। অমলার হাসি পায়, কষ্টও হয় জহ্নুর হতাশ মুখ দেখে— বাঘের উপর একটা সুতীব্র অভিমানও হয়।

দেড় দিন কেটে গেল সুন্দর এই জঙ্গলে। এক পলকের একটু দেখা দিলে কি এসে যেত ওর?

কিসলি বনবাংলোয় ভালো করে ব্রেকফাস্ট সেরে ওরা সেই একই পথ ধরে ফিরেছে ধীরে ধীরে। তবে সূর্য ধীরে ধীরে মাথার ওপর উঠেছে। এখন অরণ্যচরদের বিশ্রামের সময়। চাকায় নুড়ি পাথর ও শুকনো ডালপালা ভাঙার শব্দ। পাতার সর সর, পাখির ডাক এ ছাড়া আর কিছুই নেই চরাচরে — হ্যাঁ, আছে অবশ্য প্রাচীন অরণ্যের নিজস্ব উদ্ভিদ্ গন্ধ— যা ত্বক্, রক্ত, মজ্জার মধ্যে দিয়ে ঢুকে একেবারে আত্মায় মিশে যাচ্ছে। ফেরার পথে ঠাণ্ডা ছিল না। জহ্নুর পাশে বসে ওর হাত ধরে ছিল অমলা। আর মাঝে মধ্যেই চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাসে টেনে নিচ্ছিল অরণ্যের কস্তুরী ঘ্রাণ।

আবার সেই টুরিস্ট লজ। পাঞ্জাবী খাওয়া দাওয়া, লো ভল্যুমে হিন্দি মিউজিক। খিদে পাচ্ছে কিন্তু পেট ভরছে না। খাওয়ার পর কালকের চেয়েও আরও হতাশ জহ্নু ঘুমোতে চলে যায়। উদয় আর রুহিও দরজা বন্ধ করে নিয়েছে। অমলা আজ ভিতরে যাবে না। অমলা বাইরের বারান্দায় বসে আজ দুপুরকে দেখবে। অরণ্যের দুপুর। তার ঝিম ধরা বসে থাকা। তার ওৎ পেতে গুঁড়ি মেরে এগোনো। বনবাংলোর হাতার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে চিরহরিৎ শাল বন, ঠিক দুপুরেও তার ভিতরে ঘন ছায়া। দীর্ঘ দীর্ঘ গাছেদের ছায়া মিশে আছে রোদের হলুদে। যেন মাটিতে ঘন খয়েরী হলুদের ডোরা। অবনীশ আজ দুপুরে ওদের সঙ্গে খেতে আসে নি। যেন জহ্নুর হতাশার মধ্যে রাগের আভাস লক্ষ্য করেই বিদায় নিয়ে চলে গেছে নিজের বাসায়। যাবার আগে অমলার দিকে একবার তাকিয়েছিল স্থির — যেন বলতে চাইছিল, এই বনের ভাষার মধ্যে কি লুকিয়ে আছে তুমি পড়তে পারবে, এরা কেউ পারছে না।

এ বনের মাটিতে ঘাস জন্মাতে পারে না, যেহেতু রোদ ভাল পৌঁছয় না। মাঝে মাঝে বন খালি করে ঘাস জন্মানো হয়েছে। সে ঘাসের রং খয়েরী-সবুজ।

খাওয়ার পর আজ একটা ফলসা রঙের তাঁতের ডুরে পরেছে অমলা। কপালে কালো টিপ। আঁচল লুটিয়ে পড়েছে বেতের চেয়ারের হাতল ছাপিয়ে। ভোরে ওঠার জন্য পুরো না হওয়া ঘুম ছিল মনের ভিতর, বনে ঘুরে বেড়ানোর ঈষৎ ক্লান্তি। অমলা ঘুমিয়ে পড়েছে। দিন এগোচ্ছে। বিকেলের দিকে। জঙ্গল তার ছায়া নিয়ে গুঁড়ি মেরে অমলার দিকে আসছে — অরণ্যের ভিতর প্রতি মুহূর্তে যে প্রাণ জ্বলা নেভা করে সে যেন অসম্ভবের চেহারা নিয়ে ছুটে আসছে।

ঘুমের মধ্যে অমলা শুনতে পাচ্ছিল বন জেগে ওঠার খবর, যদিও তার চেতনা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ছিল না। পাখিদের মরণোন্মুখ ডাকাডাকি, লঙ্গুরদের চিৎকার, বার্কিং ডিয়ারদের ভৌ ভৌ ভৌ ডাক— যেন কিসের ঘ্রাণে সবাই সতর্ক। উন্মুখ, সন্ত্রস্ত হয়ে আছে ...

আলতো করে চোখ খুলেই অমলা তাকে দেখতে পেল। শালবনের ভিতর দিয়ে হলুদ কালো বিদ্যুৎ ছুটে এসে কয়েক ঝলক থমকে দাঁড়িয়েছে তার ঠিক সামনে আর দু একপা বাড়ালেই বনবাংলোর ঘাসের লন। কী দেখল সে এক ঝলকে কে জানে, ফলসা রং শাড়ির

আঁচলে, কালো টিপে, অমলার নাকছাবিতে কোন কাহিনী ছিল, দৃশ্য কাব্য — যা বহুদিন আগেকার পৃথিবীর ঘ্রাণ আনে। অমলা স্থির। সে-ও। তারপর পিছন ফিরে ছুটে মিশে গেল গাঢ় সবুজ পর্দার ভিতর।

অমলা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তার পিছনে দুটো কামরাই কাঁচের ও খড়খড়ি দরজা বন্ধ। যদি এখানে পড়ে থাকত অমলার ছিন্ন বাহু, রক্ত, ছেঁড়া খোঁড়া ব্লাউজ— ঘুমন্ত মানুষেরা বিকেলে চায়ের জন্য উঠে বুঝতে পারত কে এসেছিল। কে অমলাকে আলগোছে মুখে ধরে টেনে নিয়ে গেছে বনের মধ্যে। অমলার শরীরটা দুলছে। কপালে হাতের তালুতে ঘাম। সে বেঁচে আছে। সারা বন জুড়ে এখন আবার প্রসন্ন পাখিদের ডাক। এ প্রান্তের পাখির ডাকে সাড়া দিচ্ছে ও প্রান্তের পাখিরা, বিকেল ঘন হচ্ছে।

সে এসেছিল। দেখা হয়েছে তার সঙ্গে অমলার। কিন্তু তার কথা বলা যাবে না। কেউ বিশ্বাস করবে না। জহ্নু, উদয়, রুহিও না। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মুচকি হাসবে। বলবে, জঙ্গলের হ্যালুসিনেশন।

রাতে অতর্কিতে জহ্নুর উপর আরোহন করে অমলা। নির্বস্ত্র করতে করতে তার শরীর নিয়ে খেলা করতে থাকে। জহ্নু আশ্চর্য হয়, খুশি হয়। তারপর সেও মেতে ওঠে খেলায়। অমলাকে আলিঙ্গনে ডোবাতে ডোবাতে বলে কি হ'ল তোমার, বন্ - জরি?

কেউ জানে না কখন বিদ্যুৎ ঢুকে গেছে অমলার শরীরে।

অগোচরে।